সত্যের প্রকাশ

সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরি (রহঃ)

সাধনা যখন মানুষের মনোজগৎকে আলোকিত করে তখন সে অবাক বিস্ময়ে দেখে তার সামনে এক সীমাহীন বিশ্বের দুয়ার উন্মুক্ত হয়ে গেছে।

সূফী

ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক একটি সংকলন

মাঘ ১৪২২, জানুয়ারি ২০১৬, রবিউল আউয়াল ১৪৩৭

মৃত্যুহীন প্রাণ এবং অস্বীকারের মৃত্যু

***

আতা : আপনি সেদিন বলেছিলেন মানুষ চিরঞ্জীব, মানুষের মৃত্যু নেই। কথাটা ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি হুজুর।

গুরু : মৃত্যু হচ্ছে আল্লাহ এবং তাঁর বান্দার মধ্যে একটা ঝিল্লিসম পর্দা বিশেষ। পর্দাটা সরে গেলেই মানুষ চলে যায় তার গন্তব্যে– মাটির দেহটা পড়ে থাকে পেছনে। সে জন্যই মৃত্যুকে আমরা ইন্তেকাল বা স্থানান্তর গমন বলি, হিন্দুরা বলে পরলোক গমন। কুরআনে বলা হয়েছে প্রত্যেক মানুষই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, মরবে একথা বলা হয়নি। কিন্তু তার আগে প্রশ্ন করা উচিত, মানুষ হয়ে মরে ক'জন।

আতা : হুজুর, 'জন্মিলে মরিতে হয়' এই তো নিয়ম– এর মধ্যে আবার মানুষ হবার প্রশ্ন কেন?

গুরু : মানুষ মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করে ঠিকই– কিন্তু সব মানুষ মানুষ হয়ে মরে না। মানুষের জন্ম মাসুমিয়াত বা নিষ্পাপ অবস্থার মধ্যে। কিন্তু তার মধ্যে বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে নফস এবং রুহের দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। যে মানুষ নফস বা প্রবৃত্তির দাস হয়ে তার স্রষ্টাকে বিস্মৃত হয় তার মধ্যে মনুষ্যত্বের কী বা অবশিষ্ট থাকে? এমন মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে একটা পশুর মৃত্যুর তফাৎ কী বলো। সে জন্যই বললাম মানুষ হয়ে মরে ক'জন। যাঁরা মানুষ হতে পারে, তাঁদের মৃত্যু নেই। তাঁরা আল্লাহর চিরঞ্জীব সত্তায় বিলীন হয়ে যায়।

আতা : এ ধরনের মানুষের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য কী?

গুরু : এ ধরনের মানুষের সবচেয়ে বড় ফিতরত বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর ইমান।

আতা : হুজুর, ইমানের কথা তো সবাই আমরা মুখে উচ্চারণ করি।

গুরু : না, শুধু উচ্চারণ করার নাম ইমান নয়। ইমান হচ্ছে প্রগাঢ় বিশ্বাস তাঁর একক চিরঞ্জীব সত্তায়। বিশ্বাস তাঁর রাসুলে (সা.)– যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্য রহমতস্বরূপ। কিন্তু এ বিশ্বাসের প্রধানতম সিফত বা গুণ হচ্ছে সবর বা ধৈর্যধারণ করা। পার্থিব জীবনে সুখ যেমন তাঁর অনুগ্রহ– দুঃখও তেমনি তাঁরই অনুগ্রহ– এমন একটা অটল বিশ্বাসে যারা অবিচল চিত্তে জীবনের মুখোমুখি হন, তারাই সবরকারী। এদের জন্য কোনো বিশেষ পুরস্কারের আশ্বাস দেয়া হয়নি। আল্লাহ স্বয়ং এদের পুরস্কার অর্থাৎ আল্লাহ নিজেই এদের হয়ে যান। নবীদের জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখলে দেখা যাবে সবরই তাঁদের চরিত্রের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। হযরত ইফসুফ (আ.) কারাগারে গিয়ে অধৈর্য হননি। হযরত ইউনুস মাছের পেটে গিয়ে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস হারাননি। প্রত্যেক নবীই অসীম নিগ্রহ ভোগ করেছেন মানুষের হাতে, কিন্তু তাঁরা সবাই অবিচল চিত্তে সব যাতনা সয়েছেন। হযরত ঈসা (আ.) বলেছেন, কেউ এক গালে চড় দিলে অন্য গাল বাড়িয়ে দিও। এখানেও সবরের কথাই বলা হচ্ছে। কিন্তু সবরের মর্যাদা যেমন উচ্চে তেমনি এর পরীক্ষাও অতি কঠিন। আল্লাহ এ ধরনের বান্দাকে প্রভূত পার্থিব অনুগ্রহ দিয়ে আবার তার সর্বস্ব হরণ করেও পরীক্ষা করেন। আল্লাহ নিজেই বলছেন– ওয়ালা নাবলুওয়ান্নাকুম বিশাইয়িম মিনাল খাওফে ওয়াল জু' য়ে ওয়া নাফক্বিম মিনাল আমওয়ালে ওয়াল আনফুসি ওয়াস সামারাত [২/১৫৫]– অর্থাৎ আমি তোমাদের ভয়, ক্ষুধা এবং ধনসম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দিয়ে পরীক্ষা করবো। একই সঙ্গে আল্লাহ শুভ সংবাদ দিচ্ছেন ধৈর্যশীলদের যারা যে কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর ইচ্ছাকে সর্বান্তকরণে মেনে নিয়ে বলে আমরা তো তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করবো।

আতা : আল্লাহর ইচ্ছার কাছে যে আত্মসমর্পণ করে তার তো চাইবার কিছু থাকে না একমাত্র স্বয়ং আল্লাহকে ছাড়া।

গুরু : তুমি ঠিক বলেছো। সে জন্যই ধৈর্যশীলদের পুরস্কার প্রসঙ্গে আল্লাহ সুরা নাহলের ৯৬ নং আয়াতে বলেছেন– মা ইনদাকুম ইয়ানফাদু ওমা ইন্দাল্লাহে বাক্ব ওয়ালা নাজযিইয়ান্নাল্লাজিনা সাবারু আজরাহুম বিআহসানে মাকানু ইয়া মালুন– অর্থাৎ তোমাদের কাছে যা আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে কিন্তু আল্লাহর কাছে যা আছে তা চিরস্থায়ী। নিশ্চয়ই আমি ধৈর্যশীলদের তাদের কাজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দেবো।

আতা : কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ এই সবরের মোকাম হাসিল করতে পারবো না। আমরা তো গুনাহ করছি– হরদম করছি। শান্ত চিত্তে তাঁর ইচ্ছাকে মেনে নিতে পারছি কোথায়?

গুরু : সে জন্যই বলা হয়েছে নিরাশ হয়ো না। নিরাশ হওয়াটা কুফরির শামিল (সুরা ইফসুফ, আয়াত নং ৮৭)। দেখো, তোমরা গুনাহ বলতে কী বোঝো জানি না। আসলে আমি বোধহয় সওয়াব-গুনাহ কোনোটাই বুঝি না। তবে গুনাহ জিনিসটাকে সামান্য বোঝার চেষ্টা করে যেটুকু বুঝেছি তাতে মনে হয় মানুষের দেহের সঙ্গে এর একটা তুলনা চলে। দেখবে তোমার দেহ এমন কিছু গ্রহণ করে না যা তোমার দেহের প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এমন রক্ত তোমার জন্য মৃত্যুর সমান। এমন খাদ্য তোমার দেহ গ্রহণ করবে না যা তোমার দেহযন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তেমন খাদ্য তোমার জন্য বিষ। মানুষের দেহের যেমন কিছু অ্যান্টিজেন বা বিষবৎ কিছু তৈরির শক্তি আছে, মানুষের আত্মারও তেমনি কতোগুলো বৈরী শক্তি আছে। এই বৈরী শক্তিগুলোকে আত্মা গ্রহণ করতে রাজি হয় না। কিন্তু আত্মার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যখন তা গ্রহণ করা হয় তখন আত্মা রোগগ্রস্ত হয়– এরই নাম গুনাহ। দেহের ক্ষেত্রে একে আমরা বলি অসুস্থতা। দেহ অসুস্থ হলে ডাক্তারের কাছেন দৌড়াই। কিন্তু আত্মা অসুস্থ হলে নিজের কাছে নিজেই তা স্বীকার করি না। কিছু লোক মনে করে জীবন তো পড়েই আছে– একবার তওবা করে নিলেই চলবে। এতো তাড়াতাড়ি কিসের। কিন্তু এদের জীবনের শেষে তওবা আল্লাহ কবুল করবেন না। আল্লাহতায়ালা স্পষ্ট বাক্যে বলছেন– তওবা এদের জন্য নয়। কিংবা তওবা তাদের জন্যও নয় যারা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে (৪/১৮)।

আতা : কাফেররাই তো কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। সুতরাং তাদের আবার তওবা কিসের?

গুরু : ভুল করছো আতা– কোনো কোনো মুসলমানও কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে পারে। ইমান যার নেই তাকেই তো আমরা কাফের বলি, তাই না। রাসুলে পাক (সা.) সত্তর রকম কবিরা গুনাহর কথা উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে সতেরটি কবিরা গুনাহ আছে যা করলে ইমান থাকে না। তওবা করে কালেমা না পড়লে সে কাফেরই থেকে গেলো এবং এ অবস্থায় মৃত্যু হলে সে তো কাফের হয়েই মরলো।

আতা : হুজুর, এ সতেরটি গুনাহ কী?

গুরু : এ গুনাহগুলোর কিছু আমরা ক্বালব দিয়ে করি, কিছু করি জবান বা মুখ দিয়ে, কিছু হাত দিয়ে, কিছু গোপন অঙ্গ দিয়ে। এগুলো হচ্ছে–

১. আল্লাহকে অস্বীকার করা। ২. অনুতপ্ত না হয়ে একই গুনাহ বারেবারে করা। ৩.আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া। ৪.আল্লাহর গজবের পরোয়া না করা। ৫.মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। ৬.কোনো নিষ্পাপ মহিলার চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করা। ৭. মিথ্যা কসম খাওয়া। ৮. জাদুটোনা, তাবিজ দিয়ে কারো ক্ষতি করা। ৯. মদ্যপান করা– যতোক্ষণ নেশা থাকে ততোক্ষণ ইমান থাকে না। ১০. এতিমের হক মারা। ১১. সুদ খাওয়া। ১২. নিজের গোপনাঙ্গের হেফাজত না করা। ১৩. সমকামিতায় অংশগ্রহণ করা। ১৪. নিজের পুরুষত্ব নষ্ট করে ফেলা। ১৫. কাউকে হত্যা করা। ১৬. চুরি করা। ১৭. সন্তানের পক্ষে বাবা-মার মনে কষ্ট দেয়া।

ওপরের এ কাজগুলোর প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে কাজ করার এরাদা বা ইচ্ছা করার মুহূর্ত থেকে কাজ সম্পন্ন হবার পর তওবা না করা পর্যন্ত একজন বিশ্বাসীরও ইমান থাকে না। সুতরাং এ অবস্থায় মৃত্যু হলে মুসলমান বলে পরিচিত ব্যক্তিও কাফেরের

ইসলাম

মুহাম্মদ আলমগীর

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কুরআন আমাদের সারাক্ষণ আল্লাহর সামনে নত হবার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নত হওয়া নতি স্বীকার করার প্রতীক। বিষয়টিকে হেলাখেলায় নিলে আমাদের ভেতরে বিদ্রোহ জন্ম নিতে পারে এবং আমরা অমান্যকারীতে পরিণত হয়ে যেতে পারি। আমাদের এই পরিণতি যেন না হয়, সেজন্যই নিয়মিত এবাদত। এটাকে সামরিক বাহিনীর সকাল-বিকাল বিরক্তিকর অনুশীলন ও কুচকাওয়াজের সাথে তুলনা করলে ভুল হবে। এবাদতের এই কার্যক্রমের মাধ্যমে আমরা এ বিষয়ে সদা জাগ্রত থাকি যে আল্লাহই এককভাবে আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই কাছে আমরা দায়বদ্ধ। আমরা তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতার অধীনে রয়েছি। তিনি আমাদের অনেক অধিকার দিয়েছেন, কিন্তু পরম ক্ষমতার অধিকারী স্বয়ং তিনি। এবাদতের মাধ্যমে এটা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে; বারংবার তাঁর প্রতি আনুগত্য নবায়ন করতে হবে।

একই কারণে, অর্থাৎ আনুগত্য দেখাবার জন্য, ধর্মহীন লোকেরা সকাল-বিকাল তাদের পতাকাকে সালাম করে ও গৌরবান্বিত করে। আমরাও আল্লাহর গৌরব উচ্চারণ করি, ঠিক সেইভাবে যেভাবে আমাদের শিক্ষক মহানবী (সা.) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

এটা ঠিক যে অনেকে একদিকে এবাদতের আচার-অনুষ্ঠান পালন করে, আর অপরদিকে বিনা দ্বিধায় অনেক অন্যায় কাজের সাথে জড়িত থাকে। এটা এক ধরনের মোনাফেকি অর্থাৎ দ্বৈত-আচরণ। ধর্ম ও নৈতিকতার আসল উদ্দেশ্য বিকৃত হয়ে গেলে, অথবা এগুলোর লক্ষ্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে, এটা সম্ভব। মনে রাখতে হবে যে, ধর্মের প্রতিটি আচার-আচরণ একে অন্যের পরিপূরক। ধর্ম একটি harmonious whole বা সমন্বয়িত সমষ্টির নাম। ঠিক যেমন এবাদতের আচার-অনুষ্ঠানকে বাদ দিলে নৈতিক নীতিমালা মূল্যহীন হয়ে পড়ে, তেমনই নৈতিক উৎকর্ষ-সাধনকে বাদ দিলে আচার-অনুষ্ঠান অসার হয়ে পড়ে। আচার-অনুষ্ঠান পালন করার পর কেউ যদি মনে করে যে তার কাজ শেষ হয়ে গেছে, তাহলে সেটা হবে অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক ধারণা। যাদের ধর্মহীন বলা যায় না, তাদের অনেকে এই ভুলটিই করেন। তারা আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন, কিন্তু আল্লাহকে যেভাবে স্মরণ করার কথা, তা করেন না। নামাজের আসল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে কুরআন এই সচেতনতার কথাই বলেছে, যেমন: আমাকে মনে রাখার জন্য নামাজ কায়েম করো।

অনেকে মনে করে, আমরা এবাদতের অনুষ্ঠানগুলো হিসাবমতো পালন করছি, অতএব আল্লাহ আমাদের ওপর নিশ্চয় সন্তুষ্ট, আর এটাই যথেষ্ট। এরপর আমরা যা কিছু করি, সেগুলো জীবনের স্বাভাবিক অংশ। বেঁচে থাকার তাগিদে এগুলো না করলে চলে না; এতে দোষের কিছু নেই– যেমন চুরি, মিথ্যা, সম্পত্তি দখল ইত্যাদি। আসলে এ ধরনের চিন্তা আত্মপ্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা ধর্মের বিকৃতি। এটাকে মেনে নেয়া যায় না। তাই নিষ্ঠাপূর্ণ এবাদতের পাশাপাশি মানুষের সাথে মানুষের লেনদেন এবং সব রকম আচার-ব্যবহার উচ্চমাত্রার নৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে হওয়া উচিত।

আমরা জানি মানুষের স্বভাব পারদের মতো; সে স্থির থাকতে পারে না। সে এই মুহূর্তে একটা চায়, পর মুহূর্তে আরেকটা চায়। সে তার সঙ্কল্প ভুলে যায়। সে পার্থিব সুবিধা অর্জনে আর লাভ-ক্ষতির হিসাবে বিভোর থাকে। এসব দুর্বলতার কারণেই তাকে সারাক্ষণ স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। অতএব যাদের ধর্মীয় জীবনে ভালো ও মন্দের মিশ্রণ রয়েছে, তাদের উচিত ধর্মের সঠিক ধারণা অর্জন করা। এবাদতের অনুষ্ঠান হোক আর নৈতিক মূল্যবোধ হোক, দুই ক্ষেত্রেই আমাদের অনেক সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, অনেকেই চায় না যে তাকে শুদ্ধ-অশুদ্ধ কী, তা স্মরণ করিয়ে দেয়া হোক! সে মনে করে সে যে কাজ করছে, তার পেছনে যে সূক্ষ্ম কারণ রয়েছে, তা এই সব সঙ্কীর্ণমনা লোকেরা বুঝবে না– আল্লাহর সাথে তার বোঝাপড়া হয়ে গেছে।

আবারো বলতে হয়, নৈতিক শুদ্ধতা আর ভক্তিপূর্ণ এবাদত, এই দুটি আল্লাহরই নির্দেশ। এই আচরণমালা দুটি তাঁরই ইচ্ছা, অন্য কারো ইচ্ছা নয়। তিনি একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটা পালন করতে বলেননি। কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর কোনটা কম গুরুত্বপূর্ণ, তিনি তাও বলেননি। তাই একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায়, একটাকে বাদ দিলে অন্যটার কোনো অস্তিত্বই থাকে না, অর্থাৎ অন্যটাকে মেনে নেয়ার কোনো যুক্তি বাকি থাকে না। এই প্রসঙ্গে বলতে হয় যে ইউরোপ ও আমেরিকানদের দাবি যে তারা মিথ্যা কথা বলে না, চুরি করে না, আসলে সত্য নয়। আসলে তারা ব্যক্তিস্তরে, সমষ্টিস্তরে, জাতিস্তরে, আন্তর্জাতিকস্তরে, মোটকথা জীবনের সর্বস্তরে যেটা পালন করে সেটাকে বলা হয় Pragmatism বা সুবিধাবাদ। অর্থাৎ, যদি সত্য কথা বললে সুবিধা হবে তাহলে তারা সত্য কথা বলবে, আর যদি মিথ্যা কথা বললে সুবিধা হবে তাহলে তারা মিথ্যা কথা বলবে, ইত্যাদি। তারা যে শুধু ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানকে বাদ দিয়েছে তাই নয়, একটু খুঁটিয়ে দেখলে পরিষ্কার হয়ে যায় যে তারা নৈতিকতাকেই মানে না।

ধর্মকে বাদ দিলে এই প্রশ্নই থেকে যায়– নৈতিকতা কেন? তারা বলে, এটা তো মানুষের সৃষ্টি। এগুলো সেকেলে মূল্যবোধ। এগুলোর পরিবর্তন হওয়া উচিত। ফলে, তারা পশুদের মূল্যবোধকে আপন করে নিয়েছে। তারা পশুদের পর্যায়ে নেমে গেছে। তাদের জীবনে এখন জঙ্গলের আইন চলছে। এর উপমা হলো গাছের শিকড়গুলো যদি উপড়ে ফেলা হয়, তাহলে স্বাভাবিক পুষ্টি না পেয়ে গাছটি আস্তে আস্তে মরে যাবে, এটা কেবল সময়ের ব্যাপার। আমাদের নৈতিক জীবনের শিকড় কোথায়? প্রাথমিক শিকড় হলো পরিবারের শিক্ষা, তারপর সমাজের রীতিনীতি, তারপর প্রচলিত মূল্যবোধ। এগুলোর পেছনে প্রধান শিকড় হলো ধর্মীয় অনুশাসন যা পুরুষানুক্রমে পিতামাতা থেকে সন্তানের হাতে তুলে দেয়া হয়। এই শিকড়গুলোর যে কোনোটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে সমাজের নৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়।

গবেষকরা বলছেন যে আজ সাধারণভাবে মানব জীবনে এবং বিশেষভাবে ইউরোপীয় জীবনে যে নৈতিক অধঃপতন হয়েছে, সেটা মোটামুটিভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে শুরু হয়েছিল। তখন তাদের বুদ্ধিজীবীরা বলতে শুরু করলেন যে দেশপ্রেমের কোনো মূল্য নেই, এটা উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে একটা প্রতিবন্ধকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ধর্মকে জলাঞ্জলি দেয়ার পর তাদের এই চিন্তাধারা অস্বাভাবিক ছিল না। পরবর্তী সময়ে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পণ্ডিতরা অক্লান্তভাবে সকল নৈতিক প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ করে চলেছেন। ধর্ম ও নৈতিকতা এক মহাপ্লাবনে খড়কুটোর মতো ভেসে যাচ্ছে। রয়ে যাচ্ছে শুধু ডেকার্ট (Descartes), কান্ট (Kant), হেগেল (Hegel), হিউম (Hume), নীত্শে (Nietzsche) প্রমুখদের দর্শন। আর এগুলোর পরোয়াই বা কে করে? কারণ এদের একে অন্যের কথার মধ্যে কোনো মিল নেই। এগুলোর মূল্য fossil বা জীবাশ্মের চেয়ে বেশি কিছু নয়। প্রত্যেক দার্শনিক তার পূর্বসূরির দর্শনকে নাকচ করে দেন। আজ যারা দর্শনে নোবেল প্রাইজ তুলে নিচ্ছেন, কাল তাদের নামটাও কেউ উচ্চারণ করবে না। (চলবে)

মুহাম্মদ আলমগীর: ১৯৪২ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত তিনি করাচিতে শিক্ষা জীবন এবং প্রাথমিক কর্মজীবন কাটান। ষাটের দশকে তিনি মরহুম মওলানা ফজলুর রহমান আনসারী (রহ.) এবং মরহুম ড. বুরহান আহমদ ফারুকী (রহ.)-এর সান্নিধ্যে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক বিষয়াদিতে শিক্ষালাভ করেন। এই লেখাটি তাঁর **কুর'আন সম্মত মুসলিম জীবন** গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।

অ দ র্শ নে অ ধ র্ম

নিশাত বদরুল

তখন যৌবনের উচ্ছলতা আর উদ্দামতার দুর্দমনীয় উপস্থিতি গোটা শরীর ও মানসে। ধর্মবোধ তিরোহিত বস্তুবাদের কবলে পড়ে। বাম সংগঠনের সার্বক্ষণিক ছিলাম। তবে মানবকল্যাণই ছিল একমাত্র মোক্ষ। সমাজ পরিবর্তনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা দেহের কোষগুলোতেও স্থায়ী আসন গেড়ে আছে। ১৯৯৪-এর এমনি এক অলস দুপুরে গ্রাম্য হাটের এক চা দোকানির সাথে গল্প করছি। হঠাৎ সেখানে এসে হাজির স্থানীয় এক স্কুল শিক্ষক– মতিন ভাই। হাতে সেদিনের বাংলাবাজার পত্রিকা। পৃষ্ঠা উল্টিয়ে আমাকে হযরত সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরির সঙ্গে ধর্ম ও দর্শনকেন্দ্রিক কথোপকথন 'সংলাপ'-এর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। সেখানে প্রফেসর হারুন-উর রশিদের নাম দেখে চমকিত হলাম। কেননা একসময় পত্রপত্রিকার পাতায় গল্প লিখে কিছুটা খ্যাতি পেয়েছিলাম। সে সময় আমার জ্ঞানীগুরু প্রফেসর হারুন-উর-রশিদের 'শব্দের শিল্পরূপ' এবং 'তিনটি ফরাসি প্রবন্ধ' গ্রন্থ দুটি আমাকে বিমোহিত করেছিল। আমার এক কবিবন্ধু তো অনেকগুলো কবিতাই লিখে ফেলেছিল গ্রন্থ দুটির দোলায়িত ব্যঞ্জনায় আর শব্দ ভাণ্ডার ব্যবহারে। 'সংলাপ'-এর সেদিনের কথোপকথন আমাকে এতোটা বিস্ময়াভিভূত করেছিল... বিষয়টি ছিল 'কালেমা'। আমার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন, দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক বিশ্বাসের ভিত্তিমূল নাড়িয়ে দিয়েছিল এক লহমায়। আমি অনেকটা সময় ছিলাম বাকহীন। মতিন ভাইয়েরও ধর্মে বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু সেদিন তাকে মনে হয়েছিল একটা পাথরের মূর্তি। আমরা দুজন কেবল চোখে চোখ রেখে ভেতরের আলোড়ন অনুভব করছিলাম। কী এক নব-চিন্তন জলোচ্ছ্বাসের প্রচণ্ড গতি নিয়ে এতোদিনের তিল তিল করে গড়ে তোলা বিশ্বাসের দুষ্প্রবেশ্য আঙিনা ভাসিয়ে দিচ্ছিল। মনে মনে সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরির একটা ভাবমূর্তি সংবলিত ছবি নিজেই এঁকে ফেলেছিলাম হৃদয়ের গভীর গোপন কুঠরিতে। মেঠোপথে ঘরে ফেরার সময় সেদিন মনে হচ্ছিল– সজীব বস্তু (চিন্তন-সম্পন্ন) ও নির্জীব বস্তুর বিকাশের শর্ত এক হতে পারে না।

এরপর নিয়মিত বাংলাবাজার পড়ছি। সংগঠন ত্যাগের পর থেকেই তাদের রোষানলে পড়ে কেবলি এদিক-সেদিক করে বেড়াচ্ছি। মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা– কবে দেখা পাবো হুজুরের। এসময় বাইতুর রহিম জামে মসজিদের সাবেক সেক্রেটারি হাই সাহেবের এক ড্রাইভার শফিক আমাকে একদিন ৬১ মতিঝিলে নিয়ে গেলো। সে ছিল হাই সাহেবের এক ভাগ্নি আসমার স্বামীর (হারুন) ফার্মের ড্রাইভার। কাকতালীয়ভাবে সেই ফার্মের ম্যানেজার তখন আমি। তখনো জানতাম না শফিক কার কাছে নিয়ে যাচ্ছে। দরজায় ঢোকার মুহূর্তে নেমপ্লেটে চোখ পড়তেই আমার গোটা শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেলো। একি! যার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় আমি তরী ভাসিয়েছি, সেই হালছাড়া তরী আপনাতেই এসে ভিড়ে গেলো প্রেমের চরায়। ভেতরে ঢুকে কদমবুছি করে দাঁড়াতেই তিনি বসতে বললেন। সামনে বসে মনে হলো এমন সুদর্শন, শান্তদৃষ্টি ও প্রকৃতির যে ভাবমূর্তি তাঁর এঁকেছিলাম মনে মনে– এ যেন অবিকল সেই প্রতিমূর্তি। আমাকে তিনি শুক্রবারগুলোতে মসজিদে আসার আহ্বান জানালেন। জীবনাচরণের কিছু বিষয় তুলে ধরলেন। আংটির জন্য কাগজে ছক এঁকে ও লিখে দিলেন। সাথে এ কথাও স্মরণ করিয়ে দিলেন– 'আমি মসজিদের কাজ অফিসে করি না আর অফিসের কাজ মসজিদে করি না।' আংটি নিয়ে যেন মসজিদে যাই। আমি তখনো মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর বাক্যশ্রবণ ও সৌম্য জ্যোতির্ময় মুখশ্রী দর্শনে ধ্যানমগ্ন। তাঁর দর্শনে আমার ভেতর ধর্মবোধ জাগ্রত হলো। ভেতরের সমস্ত 'কু' যেন পিষ্ট হয়ে সু-চিন্তায় আবিষ্ট। আমি অনুভব করলাম– আমার ভেতর অন্য কেউ জেগে উঠেছে। যাঁকে আমি কোথায় যেন দেখেছি অথচ তাঁর নাগাল পাইনি। আজ মুহূর্তের ঝাপটায় সব কিছু যেন ওলট-পালট হয়ে গেলো। প্রশান্তির ছায়া আমাকে করলো শীতল। এক মহাশক্তি আমাকে ঘিরে ধরে নতুন এক জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলে সঞ্চিত বিশ্বাসের জমাট অন্ধকার দূর করে দিলো। আমার ধ্যান ভাঙলো চা পানের জন্য শফিকের ডাকে। হুজুরের ঠোঁটের কোণে তখন মধুমাখা হাসি। সেদিন নতুন এক 'আমি' ফিরে আসি জৌনপুরি-বৃত্তের সুরভিত গুলিস্তাঁ থেকে।

এরপর দীর্ঘদিন তাঁর আলোকিত বলয়ে থেকে ধর্মের বিলুপ্তপ্রায় বিষয় নতুন করে জেনেছি। তিনি বলেছেন, পরকালে শান্তির জন্য চাই সাধনা। সাধনা ছাড়া জীবন পশুর সমান। এজন্য তিনি কায়কর্মশুদ্ধি, বাককর্মশুদ্ধি ও মনঃকর্মশুদ্ধি বিষয়ে তাগিদ দিয়েছেন। মনে মনে যে জেনা হয়– এটা আমি প্রথম তাঁর তাকরির থেকেই জেনেছি। জেনেছি বিকারমুক্ত চিত্তেই অনাবিল সুখ ও শান্তি। একসময় তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি এবং মুখশ্রী দর্শনে আমূল পরিবর্তন হয়েছে আমার মতো নাস্তিক ও বহু পাপিষ্ঠের। এগুলো এখন কেবলি স্মৃতি। ২০০১ সালে তাঁর আড়াল হয়ে যাওয়ার পর অনেকের অনেক সুন্দর অভ্যাস অনভ্যাসে পরিণত হতে দেখলাম। লক্ষ করি, পরিচিত জনের অনেকের আচার-ব্যবহারে ধর্মবোধ তিরোহিত আর নিভৃতে কাঁদে তাঁর বাণী-মাধুর্য। তিনি বলেছিলেন, আমাদের পাপ করার চেয়ে স্রষ্টার ক্ষমা করার শক্তি অনেক বেশি। তাই একমাত্র চাওয়া– হুজুর জৌনপুরির ক্ষমাসুন্দর বৃত্তে যেন ঠাঁই হয় আমাদের। আজ জন্মদিনে তাঁর লেখা সেই কবিতাটি মনে পড়ছে– দীপ জ্বেলে যাই সবার আধারে/নিজের ছায়ায় রহি কাঁদিবারে/হয়তো বা আমি বেঁচে রব শুধু/ছিঁড়ে ফেলা কাহিনীতে।

কিন্তু আমাদের শপথ: আপনার মিশনকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাবো আপনারই ইচ্ছায়। আমিন। □

আত্মার গহীনে স্রষ্টার উপলব্ধি

শেখ মুহাম্মদ সা'ঈদ আল-জামাল আর-রিফাই আস-সাজিলি

ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন
নিশ্চিতভাবেই আমরা আল্লাহর এবং নিশ্চিতভাবেই আমরা তাঁরই কাছে ফিরে যাবো।

দীর্ঘ সময় ধরে আল্লাহর সেবায় নিয়োজিত থেকে এবং অগণিত মানুষকে হাকিকতের পথে জাগ্রত করে বিগত ১১ নভেম্বর ২০১৫ সালে আমেরিকার সময় দুপুর আড়াইটায় শেখ সিদি মুহাম্মদ আল জামাল (রহ) স্রষ্টার কাছে ফিরে গেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। সিদি জামাল ১৯৩৫ সালে পবিত্রভূমি প্যালেস্টাইনের তুলকামে জন্মগ্রহণ করেন এবং দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি মসজিদ আল-আকসার একজন প্রধান ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষক ছিলেন। তিনি ১৯৯৪ সালে প্রথম আমেরিকাতে আসেন এবং তারপর থেকে প্রতি বছরই আমেরিকাতে আমন্ত্রিত হয়ে আসতে থাকেন এবং তাঁর হাতে বায়াত দেন বিপুল সংখ্যক মানুষকে যারা তরিকতের সুঘ্রাণে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং পালন করছেন। তিনি শেখ আবদুর রহমান আবু আর রিসাহ (রহ)-এর কাছ থেকে খেলাফত পেয়ে সাজিলিয়া তরিকতের শেখ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে এসেছেন। মৃত্যু সম্পর্কে তিনি তাঁর এক বই 'পাথ টু আল্লাহ'-তে লিখে গেছেন: "(আল্লাহকে প্রেম নিবেদন করা) মানুষের জন্য মৃত্যু জীবনের চাইতেও শ্রেষ্ঠ এবং অনেকগুণ বেশি খুশির কারণ। তাঁরা আল্লাহকে পাওয়ার জন্য সর্বস্ব বিক্রি করতে প্রস্তুত। এঁরা জানেন যতক্ষণ তাঁরা মৃত্যুবরণ না করেন ততক্ষণ তারা সত্যিকারের জীবনে প্রবেশ করবেন না। যারা সাধারণ মানুষের মতো মৃত্যুবরণ করে তারা নয়, বরং যাঁরা আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁরাই সত্যিকারের মৃত্যু পেয়েছে। 'হে আল্লাহ আমি চিরকাল ও বারবার তোমার পথে মৃত্যুবরণ করতে চাই (ফানা) যেন আমি তোমার সাথে চিরজীবন বেঁচে থাকতে পারি, যেন আমি তোমার মহাপবিত্র সত্তার অসীম সাহচর্য লাভ করি, যেন তোমার রহস্যময় অস্তিত্বের (বাকা) যে পুরস্কার তুমি তোমার প্রিয়জনকে দিয়ে থাকো তা যেন লাভ করি। তাঁরা সকল সময় পরম আনন্দের জগতে বাস করেন। তাঁরা তোমার সাথে সংযুক্ত সবসময়। ও আমার প্রিয়তম, আমার জীবন অস্তিত্ব এবং আমার রুহ আমি তোমার রাহে কুরবানি করছি। তোমার মাঝে মৃত্যুবরণ সহজ, কেননা এতো তোমারই জন্য।'"

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

গুপ্ত রহস্য (সির্ / sirr): সির্ হলো মহাপ্রভুর এক অতি সূক্ষ্ম (লাতিফ) বৈশিষ্ট্য এবং যখন এটি এক ধাপ নেমে আসে তখন তা 'রুহ বা আত্মা' (spirit) নামে এবং আরো এক ধাপ নাজিলে এটি 'অন্তর' বা 'আধ্যাত্মিক হৃদয়' (heart) নামে পরিচিতি লাভ করে। প্রকাশিত জগতে যার নামকরণ করা যায়- নফস, আত্মা, অন্তর ও গুপ্ত রহস্য বা সির্। নামের বহুত্ব মানে এই নয় যে যাকে নাম দেওয়া হয়েছে তিনি বহু, বরং এটি একটি অস্তিত্বের বিবিধ নাম। এর ব্যাখ্যা হলো যে পরম পবিত্র এবং প্রশংসিত আল্লাহ রুহকে তাঁর অদেখা ভুবনের বাছাই করা নুর থেকে তৈরি করেছেন এবং তাকে সযত্নে সংরক্ষিত করেছেন যেন এটি পরিপূর্ণভাবে স্রষ্টার পরিচয়ে পরিচিত থাকতে পারে। এর ফলে মানুষের রুহ এর আদি ও অকৃত্রিম অবস্থায় আল্লাহর প্রেম ও একত্ববাদে ডুবে থাকে এবং আল্লাহর পবিত্র নাম ও গুণাবলির পরিচয় জেনে থাকে। এটি সম্পূর্ণ কলুষতামুক্ত অবস্থায় সেভাবেই থাকে যা আমাদের ধারণারও বাইরে। মহিমান্বিত আল্লাহ এই আত্মাকে এর পরে মানুষের দেহে স্থাপন করে থাকেন এবং এর স্থিতির ফলেই শরীর তার নড়াচড়া যেমন করতে পারে তেমনি চৈতন্য বা চেতনা লাভ করে।

যখন আত্মা শরীরে স্থিতিলাভ করে তখন এটিকে বলা হয় নফস। নফস অনেকটা সূক্ষ্ম ধোঁয়ার (subtle vapour) মতো যা জীবনীশক্তি, নড়াচড়ার শক্তি এবং চেতনা বহন করে। সুতরাং নফসের বিভিন্ন অবস্থা রয়েছে কিন্তু আলাদাভাবে নফসের নিজস্ব সত্তা নেই কেননা এটি রুহ বা জান এবং শরীরের একীভূত অবস্থায় অস্তিত্ব পেয়ে থাকে, যখন শরীর থেকে জান আলাদা হয়ে যায় তখন নফস তার স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলে। যতক্ষণ নফস বান্দাকে পরিচালিত করে থাকে ততক্ষণ এটি নিন্দার অধিকারী বৈশিষ্ট্যসমূহের আধার।

অন্যভাবে প্রকাশ করলে বলা যায়, রুহ বা জান নফসের হাতে বন্দি। স্বার্থপর নফসের মূল কাজ হলো নিজের চাহিদা ও ক্ষুধা পরিতুষ্ট করা। কিন্তু এর ফলে সে স্রষ্টার উপস্থিতি থেকে নিজেকে সরিয়ে ফেলে এবং রুহের উজ্জ্বলতা থেকে বঞ্চিত হয়। নিন্দাজনক বৈশিষ্ট্য এবং নিম্নগামী প্রবণতার মধ্য দিয়ে নফস রুহের ওপরে জয়ী হয় ও ব্যক্তিকে দুর্নীতিগ্রস্ত (ফাসিক) করে তোলে এবং স্রষ্টার আদেশ-নিষেধ থেকে সে দূরে সরে যায়।

যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তি স্রষ্টার আদেশ-নিষেধ বিমুখী হয় এবং নিজের কুপ্রবৃত্তি ও খেয়ালখুশির দাসত্ব করে ততক্ষণ তাকে 'আজ্ঞাকারী নফস' বা আন-নফস আল-আম্মারাহ নামে ডাকা হয়, কেননা এটি মন্দের দিকে আদেশদানকারী। যখন স্রষ্টার নূর নফসের ওপরে প্রবাহিত হয় তখন নফস নিজের কার্যক্রমের জন্য নিজেকে দোষারোপ করে এবং অনুতাপ ও অনুশোচনা করতে আরম্ভ করে। এর ফলে নফস থেকে নিন্দাকারী বৈশিষ্ট্যসমূহ দূরে সরতে থাকে। এ অবস্থায় নফসকে বলা হয় 'অনুশোচনাকারী নফস' বা আন-নাফস আল-লাওয়ামাহ।

স্রষ্টার নূর নফসের ওপরে প্রবাহিত হলে তারা দাবি করে নফসের বড় ধরনের অবাধ্যতা বা পাপকার্য থেকে তাকে বিরত রাখতে, কিন্তু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অবাধ্যতা তখনো বিদ্যমান থাকে। এমতাবস্থায় ধীরে ধীরে এটি স্রষ্টার পবিত্রানুভূতি লাভ এবং স্রষ্টার উপস্থিতি উপভোগ করতে শুরু করে এবং হৃদয় নামে পরিচিতি লাভ করতে থাকে। এর ফলে নফস আন্দোলিত হয় এবং তার প্রকৃত যে অসীম জগৎ তার প্রতি আকাঙ্ক্ষিত হতে আরম্ভ করে। কখনো কখনো নফসের যে পুরু দৈহিক ও জৈবিক জগতের পর্দা তা হৃদয়কে অসীম জগৎ থেকে আলাদা করে এবং হৃদয়কে নফস কব্জা করে বসে। এ কারণেই হৃদয়কে আরবি ভাষায় 'কলব' বলে যা 'কালাবা' শব্দ থেকে উৎপন্ন যার অর্থ যা ঘন ঘন ঘুরে বা অবস্থান পরিবর্তন করে। ঠিক একই ভাবে আধ্যাত্মিক হৃদয়ও ঘূর্ণায়মান বা তার অবস্থা পরিবর্তিত হয়। অনুবাদ: সাদিক মো. আলম (চলবে)

■ **প্রধান সম্পাদক :** প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ ■ **নির্বাহী সম্পাদক :** নিশাত বদরুল ■ **অঙ্গসজ্জা :** মেটাকেভ পাবলিকেশন্স ■ সৈয়দ রশীদ আহমদ মিশন ফাউন্ডেশনের পক্ষে সৈয়দ জুনায়েদ কে দোজা কর্তৃক ৯৪, নিউ ইস্কাটন, বাংলামটর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং জিনিয়াস প্রিন্টার্স ৪৬/১ পূর্ব তেজতুরী বাজার, ফার্মগেট, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। প্রাপ্তিস্থান: বাইতুর রহিম জামে মসজিদ ও আয়েশা হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়, ১২২১/১ পূর্ব মনিপুর, মিরপুর ঢাকা।